উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য ও পন্থা

—কঙ্কা জামিল খান

অর্থনীতিবিদ মাইকেল টোডারোর (Michael Todaro) মতে উন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ণবন্টন, চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক কাঠামো, জনগণের মনোভাব এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নের একটি বহুদিক-বিশিষ্ট প্রক্রিয়া।[১] যদিও উন্নয়ন প্রশাসন একটি বিতর্কিত বিষয় তথাপি আর, কে, হোপ উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম উপযুক্ত সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা-— উন্নয়নগামী দেশগুলোর লোক প্রশাসনের অবস্থান এবং দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ অধ্যয়ন ও উপদেশনাকে উন্নয়ন প্রশাসন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২]

উন্নয়ন প্রশাসনের ইতিহাস অতি-সাম্প্রতিক কালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্বাসিত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল প্লানের অধীনে এ অঞ্চলে প্রচুর বৈদেশিক সাহায্য প্রদান করে। এ কার্যক্রমের আশাতিরিক্ত সাফল্য উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিবিদ এবং রাজনীতিবিদদের তৃতীয় বিশ্বের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। মূলত পশ্চিম ইউরোপে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং তৃতীয় বিশ্বকে সমাজতান্ত্রিক শিবির হতে বিচ্ছিন্ন রাখার তাগিদ থেকে উন্নয়ন প্রশাসন ধারণার জন্ম।[৩] কাজেই প্রথম থেকেই উন্নয়ন প্রশাসন উন্নয়ন সম্পর্কিত পাশ্চ্যাত্য ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা এবং কলাকৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রথম দিকে পাশ্চাত্যের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞদেরকে উন্নয়নগামী দেশ সমূহের উপযোগী কোনো পৃথক মডেল ছাড়াই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে পরামর্শ দান, পরিকল্পনা প্রণয়ন অথবা কার্যসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করা হয়। তখন তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান পাশ্চাত্যের উন্নয়নের মডেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই সংগত ভাবেই তাঁরা পাশ্চাত্য যে পন্থা অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে ঠিক সেই পন্থা অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য তৃতীয় বিশ্বকে উপদেশনা দিতে থাকেন। ধারণা করা হয়, পাশ্চ্যত্য যে পন্থায় তার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে ঠিক একই পন্থা অনুসরণ করে তৃতীয় বিশ্বও তাদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হবে।[৪]

এ প্রবন্ধে মূলত ঃ

১। উন্নয়নের লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল উন্নয়ন প্রশাসনের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং

২। জন্মলগ্ন থেকে উন্নয়ন প্রশাসনে অনুসৃত পন্থাসমূহ আলোচিত হবে।

১। উন্নয়নের লক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল উন্নয়ন প্রশাসনের এতিহাসিক পটভূমিঃ

উন্নয়ন প্রশাসনের লক্ষ্য আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমে উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, কেননা উন্নয়নের লক্ষ্যের উপরই উন্নয়ন প্রশাসন বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেখা গেছে যুগের শেষে উন্নয়নের লক্ষ্য পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে উন্নয়ন প্রশাসনের কাঠামো এবং কর্মপন্থাও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্যঃ

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অর্থনীতিবিদগন উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উন্নয়নের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন এবং জি এন পি বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে প্রবৃদ্ধির একমাত্র পরিমাপক হিসেবে গণ্য করেন। তাঁরা ধারণা করেন. সঞ্চয় বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক সংমিশ্রণ ঘটলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোও উন্নত বিশ্বের ন্যায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারবে।[৫]

দ্রুত শিল্পায়নকে এ দুই দশকে উন্নয়নের প্রধান পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিল্পায়নের জন্য প্রধানত দুটি পথ অবলম্বন করা হয়েছে। এক, সনাতনী কৃষি ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শিল্প খাতকে উৎসাহিত করার জন্য শিল্পায়নোপযোগী প্রযুক্তি আমদানী করা হয়েছে। এ পন্থাটি অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই, পাশ্চাত্য প্রযুক্তির পরির্বতে শিল্পায়নের স্বার্থে কৃষি খাতকে কার্যকরী করা হয়েছে, অর্থাৎ শ্রম নির্ভর শিল্প খাত প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।[৬]

এ সময় অর্থনীতিবিদদের ধ্যানধারণা অন্যান্য ক্ষেত্র (যেমন নৃতত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, লোক প্রশাসন) কে প্রভাবিত করে। নৃতত্ববিদগণ সনাতনী মনোভাব ত্যাগ করে জনগণের মধ্যে কর্মস্পৃহা সঞ্চার করার কথা বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন, প্রশাসন বিশেষজ্ঞগণ মেধাভিত্তিক লোক প্রশাসনের উপর অধিক গুরুত্ব দেন, শিল্পখাতে সমাজ বিজ্ঞাণীগণ সমাজের উচ্চবিত্তদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয় বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করেন।[৭]

পরিকল্পনাবিদ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শিল্পায়নের সাথে সম্পৃক্ত আধুনিকীকরণের দিকে গুরুত্ব আরোপ করেন। পল্লী সমাজের দরিদ্র জনগণের অজ্ঞতা এবং সনাতনী মনোভাবকে আধুনিকীকরণের অন্যতম বাধা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। মনে

করা হয় বহির্গত শক্তি এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে পল্লী সমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ ধারণার উপর ভিত্তি করে এ সময় উন্নয়নগামী দেশগুলো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং সামরিক শাসনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[৮] অন্যদিকে, প্রবৃদ্ধি মূলক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে যেহেতু উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন ছিল সেহেতু পরিকল্পনাবিদগণ সমতা বা পুর্নবন্টন–এর প্রশ্নগুলো কয়েক যুগের জন্য স্থগিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা মনে করেন যুগের শেষে অধিক কর্মসংস্থান, উন্নীত মজুরী, আধুনিকীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে উন্নয়নের সুফল দরিদ্র জনগণের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছুবে।[৯]

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন প্রশাসনঃ

উন্নয়ন প্রশাসনে এ সময় স্থানীয় স্বার্থ ও সরকারের চাইতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এ সময় প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেখা যায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিকল্পিত হওয়ায় প্রশাসকদের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র বৃদ্ধি পায়। এ সময় নিজ দেশ থেকে জ্ঞানার্জন এবং জনসাধারণের সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের মিথষ্ক্রিয়াকে তেমন উৎসাহিত করা হয়নি যার ফরে জনগণ বিশেষত দরিদ্র জনসাধারণ প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়।[১০]

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মডেলের ফলাফল

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমুলক উন্নয়নের ফলে তৃতীয় বিশ্বে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্বেও সে সব দেশের দরিদ্রতম ৪০ ভাগ জনসাধারণের দারিদ্র, অনাহার, অপুষ্টি বৃদ্ধি পায়। দেশের অভ্যন্তরে এবং তুলনামূলকভাবে ধনী দেশগুলোর সাথেও অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে[১১]। অর্থাৎ ধনী অধিকতর ধনী এবং দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হতে থাকে।

এ মডেলের ব্যর্থতার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলোকে দায়ী করা যায় [১২] ঃ–

ক) শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য উদ্বৃত্ত কৃষি খাত ছিল অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্যে এই মডেল অনুসরণের পূর্বেই ব্যাপক কৃষি বিপ্লব সংঘটনের ফলে উদ্বৃত্ত পুঁজি সংগ্রহ তেমন অসুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু উন্নয়নগামী দেশ সমূহে সনাতন কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি পুঁজি নিবিড় শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

খ) পাশ্চাত্যের শিল্প বিকাশে পুঁজিবাদী দেশসমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন কলোনীসমূহ থেকে একদিকে সস্তা দরে কাঁচামাল সংগ্রহ করেছেন অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্যসমূহের বাজার হিসেবেও কলোনীসমূহকে ব্যবহার করেছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নগামী দেশগুলোর জন্য এ ধরণের কোন সুবিধা ছিল না। বরং নব্য ঔপনিবেশবাদের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত বিশ্ব কর্তৃক তারা অসম শর্ত এবং প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

গ) পাশ্চাত্যে শিল্প বিকাশের সময় জনসংখ্যার কোন সমস্যা ছিল না বরং উদ্যোগী জনগণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের মত নতুন দেশসমূহের দ্বার উম্মুক্ত ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যায়ে অধিকাংশ উন্নয়নগামী দেশে জনসংখ্যার চাপ একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অথচ তাদের জন্য বিশ্বের আর কোন নতুন দেশের দ্বার খোলা নাই।

সত্তরের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্যঃ

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উন্নয়নের নেতিবাচক অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য সত্তরের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণে নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তিত হতে থাকে। এ চিন্তাধারায় রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ (Political Economists), Dependency Theorists এবং মানবতাবাদীগণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়নকে অধিক সামাজিক দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেন। সামাজিক দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁরা সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন ও বন্টনকে তাঁরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুইটি বিষয় হিসেবে দেখেন[১৩]।

সত্তরের দশকের মধ্যভাগ থেকে অর্থনীতিবিদগণের কাছে প্রমানিত হয় যে উৎপাদনকে ব্যাহত না করেও পূণর্বন্টন সম্ভব। দেখা যায় পূণর্বন্টন বা সামাজিক সমতা বৃদ্ধির পেছনে অর্থনৈতিক সুবিধা রয়েছে। যেমন সমবন্টন নীতি দ্বারা বিনিয়োগের হার বাড়ানো যায়। আবার প্রবৃদ্ধির সাথে শিক্ষা, ভূমি সংস্কার এবং পূণর্বন্টনকারী করের মত ইতিবাচক নীতি গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয় লক্ষ্যই অর্জন করা যায়। অর্থনীতিবিদগণ এ সময় আয়ের মাপকাঠিতে জনগণকে শ্রেণী বিভক্ত করে প্রতিটি শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৪]

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

Dependency theorists দের প্রধানতঃ দুটি চিন্তাধারায় ভাগ করা যায়। প্রথম চিন্তাধারাকে "'Neocolonial dependence model বলা হয় এবং এ দলের সদস্যরা মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার অনুসারী। তাদের মতে, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের মূলে রয়েছে উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্বের বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী সম্পর্ক; এবং উন্নয়নগামী দেশসমূহে ভূমির মালিক, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সামরিক এবং সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি সুবিধাবাদী শ্রেণীর এ বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদান। দ্বিতীয় চিন্তাধারাকে " The False Paradigm বলা হয়। এ দলের সদস্যদের মতে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের মূলে রয়েছে বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের তৃতীয় বিশ্বের অনুপযোগী এবং ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক পরামর্শ প্রদান।[১৫]

Dependency the orist রা মনে করেন তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়ন হ্রাস করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মৌলিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুণর্গঠন প্রয়োজন। সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্র মালিকানা পদ্ধতির মাধ্যমে চরম দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ, আর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকরণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের স্বপক্ষে মতামত রাখেন।[১৬]

মানবতাবাদীগণ (Humanist views) উন্নয়নের নৈতিক এবং মানবিক দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। Denis Goulet তাঁর বিখ্যাত বই " The Cruel Choice" এ অনুন্নয়ন এবং দারিদ্র্যের ভয়াবহ এবং বিভীষিকাময় চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে উন্নয়ন হচ্ছে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা করার জন্য ক্ষমতা সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া।[১৭]

অর্থনীতিবিদ মাইকেল টোডারো মানবতাবাদী চিন্তাধারার সাথে একাত্ব হয়ে উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৮]

১। মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, বাসস্থান নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ;

২। মানুষের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি;

৩। প্রকৃতি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও শোষণমূলক ক্রীত দাসত্বের থেকে মুক্তি।

সত্তরের দশকে উন্নয়ন প্রশাসনঃ

সত্তরের দশকে উন্নয়নের নতুন অর্থ উন্মোচিত হওয়ায় প্রশাসনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। উন্নয়নের সুফল জনগণের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়। স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার চাইতে স্থানীয় পরিকল্পনাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের সক্রিয় অংশ গ্রহনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া সুফল বন্টন যেহেতু একটি রাজনৈতিক বিষয় সেহেতু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আমলাতন্ত্রের জবাবদিহী নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।

আশির দশকে উন্নয়নের লক্ষ্যঃ

সত্তরের দশকের সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক উন্নয়ন চিন্তাধারা তৃতীয় বিশ্বকে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক পল্লী উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কেবল সেবা বিতরণ যথেষ্ট নয়। বরং প্রাথমিক বিনিয়োগ অন্তে উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্ধিত স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণ করার কথা তখন থেকে চিন্তা করা হয়। কাজেই আশির দশকে উৎপাদন ও বন্টনের সাবলীল প্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ উন্নয়নের একটি অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।[১৯]

বর্তমানে উন্নয়ন বলতে ১। উৎপাদন এবং বন্টন উপযোগী সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, ২। সামাজিক ন্যায় বিচার, ৩। জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণ ৪। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং ৫। প্রকল্প সমূহের অব্যাহত গতিধারাকে বোঝায়।[২০]

আশির দশকে উন্নয়ন প্রশাসনঃ

এ দশকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (১৯৮৩) তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য পরামর্শ দান করে। এ রিপোর্টের মতে লোক প্রশাসনের পরিধি সংকোচনের মাধ্যমে প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব—কারণ সরকারী প্রতিষ্ঠানের অদক্ষতার মূলে রয়েছে দক্ষ ব্যবস্থাপকের স্বল্পতা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের অনুপস্থিতি। কাজেই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত করে

প্রতিযোগিতামূলক বাজার নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে এ রিপোর্টে যুক্তি দেখানো হয়েছে।[২১]

উপরোক্ত রিপোর্টে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকের মত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথাই শুধু বলা হয়েছে, জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পূর্বের মত ধারণা করা হয়েছে যে, বাজার নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন—অধিক কর্মসংস্থান, উন্নীত মজুরী, এবং সরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করতে সক্ষম হবে।

২। উন্নয়ন প্রশাসনের পন্থাসমূহঃ

উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উন্নয়নগামী দেশগুলো নিম্নলিখিত পন্থাগুলো গ্রহণ করে থাকে। বলাই বাহুল্য যে এ সকল পন্থা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো থেকে আমদানীকৃত ব্যবস্থাপনা কৌশল বা পদ্ধতি যা উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নগামী দেশ গুলোকে ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকে। উন্নয়নের লক্ষ্য পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এ সকল পন্থায়ও নতুন চিন্তাধারা প্রবর্তিত হয়েছে।

কর্মী প্রশাসনঃ

মেধা ভিত্তিক লোক প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য বিদেশী পরামর্শদাতা উন্নয়নগামী দেশগুলোকে সব সময়ই পারমর্শ দিয়ে আসছেন। প্রশাসনে দক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে; এবং পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তুলনায় বর্তমানে উন্নয়নগামী দেশগুলোর প্রশাসনিক কাঠামো ও প্রশিক্ষণকে গণ-মুখী করার বিভিন্ন প্রয়াস নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরিজীবন পেশা ভিত্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক করার জন্য একটি দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশাসন সংস্থা গড়ে তোলার বিষয়ে পরামর্শদাতারা গুরুত্ব আরাপ করেন। এ সংস্থা সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বিধি প্রবিধি তৈরী, তাঁদের বেতনস্কেল, ভাতা, কর্মসংস্থানের মূল্যায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণ করে থাকে। পাশ্চাত্যের আধুনিক প্রশাসনিক চিন্তাধারা এবং স্থানীয় প্রশাসনিক পুনর্গঠনের সাথে একটি সেতু বন্ধন সৃষ্টি করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ উন্নয়নগামী দেশগুলোকে জাতীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করে, প্রশাসনিক তথ্য সংগ্রহের জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, গবেষণা পরিচালনা করে এবং প্রশাসনিক পূনর্গঠনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে থাকে"।[২২]

পরিকল্পনাঃ

পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে বহু বিদেশী বিশেষজ্ঞ উন্নয়নগামী দেশগুলার পরিকল্পনা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষজ্ঞদের একটি দল পাকিস্তানের জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ডকে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তানে আসেন। তাঁরা পঞ্চ বার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে, সরকারের অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতি নির্ধারণে ও পাকিস্তানী কর্মকর্তাদের এ সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানে সাহায্য করেন।[২৩]

সাধারণত উন্নয়নগামী দেশগুলোতে জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ড পাঁচ ধরণের কাজ করে থাকে যেমনঃ উপাত্ত সংগ্রহ, কর্মসূচী প্রণয়ন, গবেষণা, কর্মসূচী সমূহের সমন্বয় সাধন এবং প্রকাশনা। কর্মসূচী প্রণয়ন পরিকল্পনা বোর্ডের প্রধান কাজ এবং অপর চারটি কাজ কর্মসূচী প্রণয়নে সহযোগিতা করে। বর্তমানে জাতীয় পরিকল্পনা বোর্ডের দীর্ঘ মেয়াদী বহুখাত বিশিষ্ট পরিকল্পনার পরিবর্তে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত পরিকল্পনা দল অধিক প্রাধান্য পাচ্ছে। অর্থনীতিবিদ, প্রকৌশলী, বৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্ববিদ, প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এ সকল দল গঠিত হয়। তাঁরা মাঠ পর্যায়ে বিশেষতঃ খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এ সকল কর্মীদল স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করেন এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটির সমন্বয় সাধন করেন।[২৪]

প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ

বর্তমানে অধিকাংশ দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর অধিকাংশ জুড়ে থাকে উন্নয়ন খাতে বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যয়সহ বর্ণনা। উন্নয়নের প্রথম দুই দশকে দাতা দেশসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি প্রভৃতিতে সাহায্য প্রদান করেছেন। ষাটের দশকে দাতা দেশ সমূহ তাদের অর্থনৈতিক সাহায্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে দেখা যায় দাতাদেশসমূহ প্রকল্প সাহায্য প্রদানে অধিক উৎসাহী হয়ে পড়েন। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের পন্থা পূর্বে নির্ধারিত হয় বলে দাতা দেশগুলা তাদের সাহায্য সম্পর্কে অধিক অবহিত হওয়ার সুযোগ পান।[২৫]

একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। একত্রিত স্তরগুলোকে প্রকল্প চক্র বলা হয়। প্রকল্প চক্রে ১২ টি স্তর থাকতে পারে যেমনঃ

১। প্রকল্প চিহ্নিত করন ২। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই, ৩। প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, ৪। প্রকল্পের মূল্য নিরূপন, ৫। প্রকল্প বাছাই করন, চুক্তিপুর্ব আলোচনা এবং অনুমোদন, ৬। প্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য সংগঠন স্থাপন, ৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন, ৮। প্রকল্পের তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ, ৯। প্রকল্প সমাপ্তিকরণ, ১০। উৎপাদনের প্রসারণ এবং নিয়মিত প্রশাসনে স্থানান্তরকরন, ১১। প্রকল্প মূল্যায়ন, ১২। পরবর্তী বিনিয়োগের জন্য ফলাবর্তন।[২৬]

উপরোক্ত প্রতিটি স্তরেই সাহায্য দাতা সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ উন্নয়নগামী দেশের সরকারী কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন। একটি প্রকল্প অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত একটি সংগঠনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রয়োজন বোধে প্রকল্প বাস্তবায়বেনর জন্য নতুন ইউনিট স্থাপন করা হয়। মূলতঃ প্রত্যেক প্রকল্পের জন্য একজন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়ে থাকে যিনি বিশেষজ্ঞ, সম্পদ সরবরাহকারী এবং নীতি নির্ধারকদের সাথে সমন্বয় সাধন করেন।

বিকেন্দ্রীকরণঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সত্তরের দশকে উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে মৌলিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি সংযোজিত হওয়ার পর থেকে উন্নয়ন কর্মসূচী এবংপ্রকল্প বাস্তবায়বের জন্য নতুন পন্থা উদ্ভাবনের চিন্তা করা হয়। দেখা যায়, দরিদ্র জনগণের উন্নয়ন সাধনের জন্য পরিবর্তনযোগ্য, নমনীয় এবং জনগণের কাছে দায়ী প্রশাসন প্রয়োজন। সুতরাং জনগণের মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়। বিকেন্দ্রীকরণের প্রকারভেদ রয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সংস্থাকে দায়িত্ব অর্পন করতে গেলে যে ধরণের সাংগঠনিক কাঠামো, ক্ষমতা হস্তান্তর এবং জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে, স্থানীয় সরকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব অর্পণ করতে গেলে ক্ষমতা হস্তান্তর, সাংগঠনিক কাঠামো এবং জনগণের অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া ভিন্নতর হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, "শুধু বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রশাসনে জনগণের অংশ গ্রহণের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো এবং সমাজের ক্ষমতাবানদের দায়িত্বহীনতার সমস্যা শুধু বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দূর হবে না। তবে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের

সমন্বয় সাধন করা, উন্নয়ন কার্যক্রমকে অধিকতর স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়োজন উপযোগী করা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিক নমনীয়তা আনা সম্ভব হবে।"[২৭]

পল্লী উন্নয়ন ঃ

একটি দেশের প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় কর্মকর্তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দক্ষতা ও পরিবেশের উপর সেই দেশের জাতীয় উন্নয়ন নীতির সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইদানিং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নগামী দেশগুলোর পল্লী অঞ্চলে সেবা বিতরণের জন্য দাতা সংস্থগুলো স্থানীয় সরকারের চেয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) গুলোকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে প্রবৃদ্ধি মূখী উন্নয়ন পুঁজিপতি তৈরী করেছে কিন্তু তা সামগ্রিক উন্নয়ন কিংবা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটায়নি, কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করেনি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। দেশে নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতা সৃষ্টির ফলাফল পরিস্কার হবার পর বিশ্ব পুঁজিবাদী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে দারিদ্র্য নিরসন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কল্পে নানা মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পথ ধরেই এসেছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, বেসিক নিড এ্যাপ্রোচ ইত্যাদি মডেল যার প্রতিটির সংগেই বিশ্বব্যাংক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা পরিমণ্ডলের ওঁতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে এসব মডেলের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই একে একে জন্ম নিয়েছে কুমিল্লা মডেল, স্বনির্ভর কর্মসূচী, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সর্বশেষে এন, জি, ও মডেল। উক্ত মডেলগুলো ছাড়াও স্থানীয় সরকারগুলোকে উন্নয়নমুখী করার জন্য সেগুলোকে পূর্নগঠিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

জনগণের অংশগ্রহণঃ

বিকেন্দ্রীকরণের ও পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন প্রশাসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরন। একটি উন্নয়নগামী দেশের জনগণ যতদিন না নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতন হবে ততদিন পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ, পল্লী উন্নয়ন অথবা অন্য কোন পন্থায় উন্নয়ন আশা করা যায় না।"বর্তমানে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরনে সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাইতে বেসরকারী প্রীতষ্ঠানগুলোকে অধিক কার্যকরী মনে করা হচ্ছে।"[২৮] তারা দরিদ্রতম

সমন্বয় সাধন করা, উন্নয়ন কার্যক্রমকে অধিকতর স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়োজন উপযোগী করা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিক নমনীয়তা আনা সম্ভব হবে।"[২৭]

পল্লী উন্নয়ন ঃ

একটি দেশের প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় কর্মকর্তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দক্ষতা ও পরিবেশের উপর সেই দেশের জাতীয় উন্নয়ন নীতির সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। ইদানিং দেখা যাচ্ছে উন্নয়নগামী দেশগুলোর পল্লী অঞ্চলে সেবা বিতরণের জন্য দাতা সংস্থগুলো স্থানীয় সরকারের চেয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (NGO) গুলোকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তৃতীয় বিশ্বে প্রবৃদ্ধি মূখী উন্নয়ন পুঁজিপতি তৈরী করেছে কিন্তু তা সামগ্রিক উন্নয়ন কিংবা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটায়নি, কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করেনি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি। দেশে নৈরাজ্য ও স্থিতিহীনতা সৃষ্টির ফলাফল পরিস্কার হবার পর বিশ্ব পুঁজিবাদী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে দারিদ্র্য নিরসন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি কল্পে নানা মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ পথ ধরেই এসেছে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, বেসিক নিড এ্যাপ্রোচ ইত্যাদি মডেল যার প্রতিটির সংগেই বিশ্বব্যাংক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা পরিমণ্ডলের ওঁতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে এসব মডেলের বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই একে একে জন্ম নিয়েছে কুমিল্লা মডেল, স্বনির্ভর কর্মসূচী, সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী এবং সর্বশেষে এন, জি, ও মডেল। উক্ত মডেলগুলো ছাড়াও স্থানীয় সরকারগুলোকে উন্নয়নমুখী করার জন্য সেগুলোকে পূর্নগঠিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উপজেলা পরিষদকে স্থানীয় সরকার উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

জনগণের অংশগ্রহণঃ

বিকেন্দ্রীকরণের ও পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত উন্নয়ন প্রশাসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরন। একটি উন্নয়নগামী দেশের জনগণ যতদিন না নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের ব্যাপারে সচেতন হবে ততদিন পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ, পল্লী উন্নয়ন অথবা অন্য কোন পন্থায় উন্নয়ন আশা করা যায় না।"বর্তমানে উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরনে সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাইতে বেসরকারী প্রীতষ্ঠানগুলোকে অধিক কার্যকরী মনে করা হচ্ছে।"[২৮] তারা দরিদ্রতম

জ) প্রতিষ্ঠান নির্মাণঃ

সংগঠনের কার্যক্রমকে সমর্থন করার জন্য কোন সংগঠন যদি একটি সহযোগিতামুলক পরিবেশ ও জনসমর্থন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়— তবেই প্রাতিষ্ঠানিক জীবন অর্জন করতে পারবে বলে আশা করা হয়। প্রতিষ্ঠান নির্মানের জন্য সংগঠনের নেতাদের প্রয়োজনে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শ্রমনেতা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনসাধারণের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠান নির্মাতাদের আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করার জন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।[৩১]

আশির দশক থেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বলতে শুধু আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি বোঝায় না। তখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা নির্মাণ বলতে স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ধিত স্থানীয় প্রশাসনিক ক্ষমতাকেও বোঝায়।

ঝ) রাজনৈতিক সমর্থন সৃষ্টিঃ

সকল প্রশাসনিক পূর্ণগঠনের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন অতি প্রয়োজন। উন্নয়নগামী দেশ সমূহের সরকারকে প্রশাসনিক পূর্নগঠন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিদেশী বিশেষজ্ঞরা রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের জন্য সেমিনার আয়োজন করেন, কারিগরী সাহায্য দানের পূর্বে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মসূচী সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রণয়নে সহায়তা করেন।[৩২]

ঞ) আর্থ ব্যবস্থাপনাঃ

সীমিত সম্পদের কারণে উন্নয়নগামী দেশগুলোর আর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনায় যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় উন্নয়গামী দেশ সমূহে কেন্দ্রীয় বাজেট অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। রাজস্ব নিরূপনে উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজস্ব বন্টনে নতুন পদ্ধতি যেমন "রেভেন্যু শেয়ারিং" পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। উপরন্তু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরা বাজেটের ক্ষেত্রে কর্মসূচী বাজেট বা প্রোগ্রাম বাজেটিং, প্রকল্পের মুল্য নিরূপনের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি যেমন "Cost Benefit Analysis" প্রভৃতি প্রবর্তন করেছেন।[৩৩] সমালোচকরা এ সকল পদ্ধতি উন্নয়নগামী দেশে কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদদের যেখানে প্রকল্পের মূল্য নিরূপন এবং কর্মসূচীর সাফল্য

গণনায় অসুবিধা হয়, সেখানে উন্নয়গামী দেশসমূহে তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে এ সকল পদ্ধতি কতটুকু কার্যকরী হবে?

উপসংহারঃ

উপরে বর্ণিত উন্নয়ন কৌশলগুলোর সঠিক বাস্তবায়ন একটি দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সে কারণে সকল দেশের জন্য" একটি সঠিক কৌশল" বা মানদণ্ড" নির্দিষ্ট করা উচিৎ নয়। একটি দেশের জন্য সঠিক বা উপযুক্ত কৌশল সেই দেশের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

তথ্য নির্দেশিকা

১। Michael P. Todaro, **Economic Development in the Third World,** 3rd edition (New York and London: Longman, 1985) p. 85

২। R. K Hope, **The Dymanics of Development and Development Administration** (Westport Conn: Green wood Prees , 1984) p.65

৩। এ, টি, এম, শামসুল হুদা, "উন্নয়ন প্রশাসন লক্ষ্য ও পন্থা" (Mimeo) ১৯৮৬, পৃঃ ২-৩।

৪। Todaro, **opcit.**, p. 63

৫ Coralie Bryant and Louise G. White, **Managing Development in the Third world** (Boulder, Colorado: Westview Press, 1982) p.5.

৭। ঐ। পৃঃ ৬।

৮। ঐ।

২৫। দেখুন, Elliot R, Morss, " Institutional Destruction Resulting from Donor and project proliferation in sub- saharan African Countries" **World Development** Vol. 12. No. 4 (Great Britain: Pergamon Press Ltd, 1984) pp. 465-470.

২৬। দেখুন, Dennis A, Rondinelli, **Development projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration** (New York and London: Methuen and company, Methuen and company, 1983) pp. 1-23.

২৭। David Fashole Luke," Trends in Development Administration: The continuing challenge to the efficacy of the post colonial state in the Third World" **Public Administration and Development,** Vol. 6. No. 1 (New York John Wiley and Sons Ltd, 1986). pp 78-79.

২৮। ঐ, পৃঃ ৭৯। দেখুন, আনু মোহাম্মদ, বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্কইট ও এনজিও মডেল (ঢাকাঃ প্রচিন্তা প্রকাশনা, ১৯৮৮) পৃঃ ১–২৫

২৯। Akbar Ali Khan, " Decentralization for Rural Development in Bangladesh" **Bangladesh Journal of Public Administration** VoL III. No. 1. (Savar: BPATC, Jan. 1989) p.18.

৩০। দেখুন, ঐ। পৃঃ ৭–১৯।

৩১। Mc Curdy, **opcit .**, pp 310-311

৩২। ঐ। পৃঃ ৩১১–৩১২।

৩৩। ঐ। পৃঃ ৩১২।